কোয়ান্টাম বুলেটিন

অক্টোবর ২০২০

শুদ্ধাচার পৌঁছে দিন ঘরে ঘরে

দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের কয়েকজন তাদেরই এক সহপাঠীকে পিটিয়ে মেরে ফেলল পাশবিক হিংস্রতায়, শিশু ও নারী নির্যাতন-নিপীড়ন হয়ে উঠেছে দৈনিক পত্রিকার নিয়মিত খবর, পারিবারিক সহিংসতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে অতীতের সকল পরিসংখ্যান। এমন বহু অনৈতিকতা-অমানবিকতার পরও যা বাকি ছিল সেটাও সবার দেখা হলো সাম্প্রতিক আতঙ্ক-মহামারিকালে।

অসুস্থ মা-কে জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে সন্তান, মৃত স্বামীকে হাসপাতালে রেখে গা-ঢাকা দিচ্ছে স্ত্রী। মৃত বাবার দাফন-জানাজায় শরিক না হয়ে দূর থেকে ছবি তুলে ফেসবুকে শেয়ার করতে ব্যস্ত প্রাপ্তবয়সী পুত্র। সবমিলিয়ে বলা যায়, ভয়াবহ এক অনৈতিকতা-অসহিষ্ণুতার মহামারিতে বিপর্যস্ত গোটা সমাজ।

অথচ একজন মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার নৈতিকতা ও সমমর্মিতা। আর এর ভিত্তিটি সুদৃঢ় হয়ে ওঠে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। কারণ শুদ্ধাচারী মানুষ মাত্রই নৈতিকতা ও সমমর্মিতায় উজ্জীবিত একজন মানুষ।

মূলত সে আলোকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে একজন মানুষের পালনীয়-করণীয়-বর্জনীয়গুলো নিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে *শুদ্ধাচার* বইটি। কোয়ান্টামের দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের পথচলায় নানাভাবে সংযোজিত শান্তি, কল্যাণ ও ভালো থাকার সূত্রগুলোই স্থান পেয়েছে সুখপাঠ্য ও অনন্য এ সংকলন-গ্রন্থে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এ প্রকাশিত এই সংকলনটি নিয়ে দেশের শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন অঙ্গনের গুণীজনরা বলছেন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, পেশাজীবী কিংবা গৃহিণী, সবার জীবনেই এ বইটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাদের মতে, *শুদ্ধাচার* পাঠ ও চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারগুলো হয়ে উঠতে পারে আরো পরিশীলিত, শান্তিপূর্ণ ও সুখী—যার ইতিবাচক প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হবে সমাজ ও দেশের সর্বস্তরে।

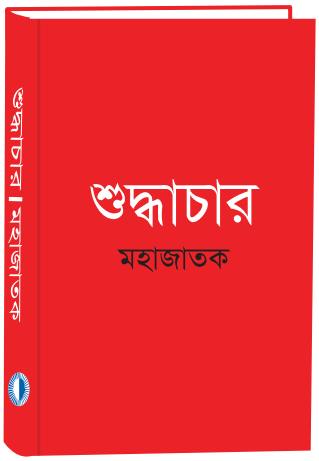

শুদ্ধাচার পাঠ ও চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারগুলো হয়ে উঠতে পারে আরো পরিশীলিত ও সুখী—যার ইতিবাচক প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হবে সমাজ ও দেশের সর্বস্তরে। এজন্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে দিতে হবে শুদ্ধাচার বইটি।

...

মিলিত উদ্যোগে সফল হয়ে উঠুক শুদ্ধাচার করসেবা।

এর পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত একটি পত্রে (২৫ মার্চ ২০২০) *শুদ্ধাচার* বইটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ অধিদপ্তরাধীন সকল অফিস/ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আসলে নিজে ভালো থাকার জন্যেও সবাইকে শুদ্ধাচারী হওয়ার আহ্বান জানানো অত্যন্ত জরুরি। চারপাশের সবাই ভালো না থাকলে নিজে ভালো থাকা কঠিন।

এ লক্ষ্যে অক্টোবরে দেশজুড়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার-শাখা-সেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুদ্ধাচার করসেবা।

সাম্প্রতিক মহামারি আমাদের জীবনে যে সংকট সৃষ্টি করে গেছে তা যতটা না স্বাস্থ্যগত, তার চেয়ে অনেক বেশি মনোগত ও চেতনাগত। যা স্পষ্ট করে তুলেছে আমাদের নৈতিক দীনতা, জাতীয় জীবনে সৃষ্টি করেছে জড়তা ও স্থবিরতা। কিন্তু অর্থনীতিসহ দেশের যাবতীয় স্থবিরতা কাটিয়ে এই মুহূর্তে প্রয়োজন নতুন গতি সৃষ্টি করা।

তাই এই জড়তা ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। নামতে হবে পথে। মেডিটেশন চর্চাকারীদের নিরাময় ও প্রশান্তির অনুভূতি-সংকলন ৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক *কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস* নিয়ে যেভাবে আমরা ইতঃপূর্বে পথে নেমেছি, কল্যাণার্থে উদ্বুদ্ধ করেছি মানুষকে, একইভাবে এবারও আমরা অংশ নেব শুদ্ধাচার করসেবায়। পথচারী থেকে পরিবার—দেশের প্রতিটি ঘরে স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়ম অনুসরণ করে পৌঁছে দেবো শুদ্ধাচারী ও সমমর্মী জীবনের আহ্বান।

শুদ্ধাচার পৌঁছে দিন আপনার আত্মীয় বন্ধু সহকর্মী প্রতিবেশী এবং পরিচিত পরিমণ্ডলে সাধ্যমতো সবাইকে। পৌঁছে দিন দেশের প্রতিটি ঘরে। একটি সুস্থ, নৈতিক ও সমমর্মী সমাজ গঠনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবদান রাখুন আপনিও।

আমাদের মিলিত উদ্যোগে সফল হয়ে উঠুক শুদ্ধাচার করসেবা।

কোয়ান্টাম দাফনসেবা

পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদা ও আপনজনের মমতায় শেষ বিদায়

কোয়ান্টামের উদ্যোগে শুরু হলো নিয়মিত দাফনসেবা কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে মৃতদেহ গোসল/ পরিচ্ছন্ন করার জন্যে একটি হাম্মামখানা স্থাপন করা হয়েছে ঢাকার বনশ্রী কার্যালয়ে।

এ কার্যক্রমের উদ্যোগে প্রথম দাফনসেবা দেয়া হয় ১৫ সেপ্টেম্বর। মৃতা ছিলেন সন্তান জন্মদানকালে পরলোকগত এক প্রসূতি। পরিবারের সদস্যরা কোয়ান্টাম স্বেচ্ছাসেবীদের ফোন করে জানালেন, মৃতদেহ গোসল করানোর কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তৎক্ষণাৎ স্বেচ্ছাসেবীরা ছুটলেন হাসপাতালে। বনশ্রীতে সদ্যনির্মিত হাম্মামখানায় মৃতদেহকে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় গোসল করিয়ে পরানো হলো কাফনের কাপড়। আপনজনের মমতায় এ দায়িত্ব পালন করলেন কোয়ান্টাম দাফনসেবার নারী স্বেচ্ছাসেবী টিম। এরপর মৃতার দাফন সম্পন্ন করেন তার পরিবারের সদস্যরা।

নবীজী (স) বলেন, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ। *(আবু দাউদ, আন-নাসাঈ)*

তাই বলা যায়, একজন শহিদকে সেবা দেয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করল কোয়ান্টাম দাফনসেবা কার্যক্রম।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সাল থেকে কোয়ান্টামের উদ্যোগে রাজশাহীতে শুরু হয় বেওয়ারিশ লাশ দাফন ও সৎকার কার্যক্রম। সে ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি দেশব্যাপী করোনায় মৃতদের দাফনসেবা দেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছাসেবীরা। এসময় ফাউন্ডেশন সিদ্ধান্ত নেয়—শুধু দুর্যোগ কিংবা মহামারিকালে নয়, পর্যায়ক্রমে এ সেবা দেশব্যাপী পরিচালিত হবে নিয়মিত একটি কার্যক্রম হিসেবে।

আর এ সেবা ধনী-গরিব নির্বিশেষে গ্রহণ করতে পারবেন যে-কেউ। মৃত ব্যক্তি সামর্থ্যহীন পরিবারের হলে আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় বহন করা হবে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকেই। কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে, মৃত ব্যক্তিকে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদা-মমতায় শেষ বিদায় জানানোর দায়িত্ব সমাজের সবার।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, চিকিৎসা নৃ-বিজ্ঞানী ও যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-অধ্যাপক ডা. শাহাদুজ্জামান। ২ মার্চ ২০২০ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৯৯ তম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন তিনি। নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

আমাদের সমাধান খুঁজে নিতে হবে আমাদেরকেই

শাহাদুজ্জামান

দার্শনিক আল বেরুনীর একটি জীবনদর্শন আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে—'প্রভু! আমাকে দীর্ঘজীবন দিও না। আমাকে একটি বিস্তৃত জীবন দাও।' আমার কাছে এই বিস্তৃত জীবনের অর্থ হলো, জীবনের প্রতি কৌতূহল, সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতর আটকে না থেকে জীবনের পরিধি বাড়ানো।

আমার লেখালেখির মূলে রয়েছে এই কৌতূহল। জীবন সম্পর্কে কৌতূহল—জীবনকে বোঝা, মানুষকে বোঝা। আসলে জীবন তো একটা বিচিত্র ব্যাপার, তাকেই আমি আমার লেখালেখির মধ্য দিয়ে দেখতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি।

একজন লেখক হলেন গাছের মতো। যত দিকেই তিনি ডালপালা মেলে দিন, তার একটা মাটি লাগে। বর্তমানে আমি প্রবাসে থাকি বটে, কিন্তু আমার মনটা গাঁথা আছে এদেশের মাটিতে।

আসলে প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় সেই অঞ্চলের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে। তেমনি একেকটা শহরও গড়ে ওঠে সেই শহরের মানুষগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যেমন, লন্ডন শহরের প্রায় প্রতিটি ইটের ভেতর আছে ওদের দীর্ঘ শোষণের ইতিহাস। চারশ বছর ধরে সারা পৃথিবীকে লুণ্ঠন করে এই শহরটা ওরা তৈরি করেছে। এখন চাইলেও ঢাকা শহরকে লন্ডন বানানো সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় সম্পদ লুণ্ঠন না করে প্যারিস লন্ডনের মতো শহর গড়া যায় না।

তাহলে আমাদের শহরটা কেমন হবে? আমাদের শহরটা হবে আমাদের মতো। পৃথিবীতে মানবজাতির সমস্যাগুলো যেমন নানা ধরনের, এর সমাধানটাও হতে হবে নিজেদের মতো করেই। সারা পৃথিবীর জন্যে ইউরোপ যে সমাধানগুলো আজ বাতলে দিচ্ছে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, তা সব দেশের জন্যে সমভাবে কাজ করবে না। আমাদের সমাধান আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। আমাদের এই মাটির ভেতরে যে অসাধারণ শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

কারণ পাশ্চাত্যের বাস্তবতা যেমন আমাদের চেয়ে ভিন্ন, তেমনি আমাদের চিন্তাগুলোও ভিন্ন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—গুড ডেথ। তাদের কাছে এটা হচ্ছে একটা মেডিকেলাইজড মৃত্যু, যেখানে চারপাশে ডাক্তার-নার্স থাকবে। এর ভিত্তিতে ওরা একটা তালিকা করেছে। সেখানে ৮০টি দেশের মধ্যে গুড ডেথ-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৯ তম এবং যুক্তরাজ্য রয়েছে ১ম স্থানে।

মৃত্যুর তথাকথিত এ আধুনিক ধারণাটির সাথে আমি একমত নই। গুড ডেথ-এর এই সংজ্ঞা কে নির্ধারণ করে দিল? কেন এটা আমাকে অনুসরণ করতে হবে? 'ডেথ ক্যাফে' বলে একটা নতুন সংস্কৃতি শুরু হয়েছে পশ্চিমা সমাজে—ক্যাফেতে বসে কফি খেতে খেতে মৃত্যু নিয়ে কথা বলা। কাজের সূত্রে আমার সুযোগ হয়েছিল এরকম কিছু আলাপচারিতা আয়োজনের। ওখানে আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করতাম, জীবনের অন্তিম সময়টা নিয়ে তোমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা বা ভয় কী? প্রায় সবাই একটা কথা বলত যে, শেষ দিন পর্যন্ত কারো ওপরে যেন আমাকে নির্ভর করতে না হয়।

কিন্তু সব দেশের সব মানুষের প্রত্যাশা যে এটাই হবে, তা না-ও হতে পারে। আমার বাবার উদাহরণ দিয়েই বলি। মৃত্যুর আগে বেশ কিছুদিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতে হতো, কাপড় পরিয়ে দিতে হতো। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম—'আব্বা, আমি যে এভাবে তোমাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি, তোমার কি খারাপ লাগে?'

আব্বার উত্তরটা আজও আমার কানে বাজে—'মোটেও না! বরং আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম আমার সেবা করার।'

আমার বাবার কাছে গুড ডেথ হচ্ছে—ছেলে তার সেবা করবে। মৃত্যুকালে বিরাট সব মেশিনের ভেতর তিনি শুয়ে থাকবেন, ডাক্তার-নার্সরা তাকে ঘিরে থাকবে, এমনটা তিনি চান নি। চেয়েছেন অন্তিম মুহূর্তে প্রিয়জনেরা তার পাশে থাকুক।

আধুনিকতা আমাদের শেখাচ্ছে, বাবা-মাকে আইসিইউ-তে নেয়া একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। যদি না নিই তবে আমি দায়িত্ব পালন করলাম না। এভাবেই আমাদের দেশে আইসিইউ কালচারটা তৈরি হয়েছে। এটা যতটা না আবেগিক, তার চেয়ে বেশি সামাজিক চাপ।

সবমিলিয়ে মৃত্যু এখন হয়ে উঠেছে একটা বাণিজ্য। ইটস আ কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট। হাসপাতাল থেকে যখন বলা হয়—'আপনি কি চান না আপনার বাবা আরো পাঁচটা দিন বেঁচে থাকুক?' এই একটি প্রশ্নই মানুষকে ভয়ংকর রকম নৈতিক দ্বিধার ভেতরে ফেলে দেয়।

রোগীকে সুস্থ করে তোলার কোনো নিশ্চয়তাই আইসিইউ দিচ্ছে না। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে শুধু মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত করছে। যাকে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে, তিনি এভাবে বাঁচতে চান কিনা তা-ও আমরা জানি না। আর যন্ত্রের ভেতর এই বাঁচাটাই বা কেমন বাঁচা? অথচ এ কারণে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে বহু পরিবার।

আমরা ভাবি, আমাদের কাছ থেকে পাশ্চাত্যের বুঝি কিছু শেখার নেই। সবসময় আমরাই শুধু তাদের কাছ থেকে শিখব। যুক্তরাজ্যের সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীদের আমরা একটি কোর্স করাই। আমি একে বলি রিভার্স লার্নিং। অর্থাৎ সময় এসেছে এখন ইউরোপকে আমাদের কাছ থেকে শিখতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বহুকাল ধরে প্রেসক্রিপশনে লেখা হতো 'বেড রেস্ট'। এখন পাশ্চাত্যে 'বেড রেস্ট'-এর বদলে লেখা হয় 'মেডিটেট'। কারণ মেডিটেশন অনেক বেশি কার্যকরী। আপনি অযথা শুয়ে থাকবেন কেন? এই সময়টা আপনি নিজেকে নিজের সামনে রেখে মোকাবেলা করুন। পাশ্চাত্য এ ধারণাটা কিন্তু পেয়েছে নন-ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন অর্থাৎ প্রাচ্য থেকে।

লন্ডনের ঝকঝকে তকতকে রাস্তা দেখে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু এর অলিগলিতে আছে অনেক স্লেদ। সেই স্লেদ আমরা দেখি না। নিজেদের স্লেদগুলোই একটু বেশি চোখে পড়ে আমাদের, যার কারণ এক ধরনের হতাশা—আমরা তো ইউরোপের মতো হতে পারলাম না! চিন্তার এই ধরনটা বদলে দিলেই দেখব বহু কিছু আছে আমাদের। আমাদের সক্ষমতা ও শক্তির জায়গাগুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে কোনো আক্ষেপ আর হতাশা আমাদের থাকবে না।

তবে পরিবর্তন হলো একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। আর যে-কোনো পরিবর্তনের নেপথ্যে প্রত্যেকেরই একটা ভূমিকা থাকে। ছোট্ট ছোট্ট সক্রিয়তার ভেতর দিয়ে আমরা ভূমিকা রাখি। তাই 'হচ্ছে না, হবে না বা অনেক বড় কিছু পারব না' বলে বসে থাকা যাবে না। নিজের জায়গা থেকে সর্বোচ্চটা দিতে হবে। সেইসাথে চেষ্টা করতে হবে—সজ্ঞানে আমি যেন কারো ক্ষতির কারণ না হই।

চকলেট খাচ্ছেন, নাকি সুস্বাদু বিষ?

আনন্দ-উৎসব উদযাপনে, প্রীতি উপহার আদান-প্রদানে আজকাল আমাদের মাথায় চট করে চলে আসে চকলেটের নাম। চকলেট খেতে মিষ্টি বটে, কিন্তু 'মিছরির ছুরি' হয়ে আপনার স্বাস্থ্যের বারোটা (!) বাজাচ্ছে কিনা সচেতন মানুষ হিসেবে সেটা একবার ভেবে দেখার অনুরোধ করি।

শিশুদের হাতে আমরা অবলীলায় তুলে দেই নানান রঙের চকলেট। পাঠক, খেয়াল করেছেন কী— কিছুদিন একই ব্র্যান্ডের চকলেট খেলে শিশু শুধু সেই চকলেটই বার বার খেতে চায়? এর কারণ, প্রতিটি আলাদা ব্র্যান্ডের চকলেটে মেশানো থাকে নির্দিষ্ট ধরনের আসক্তিকর কেমিক্যাল। ফলে শিশুরা একই চকলেট বার বার খেতে চায়!

আসক্তিকর চকলেটের জন্মকথা

চকলেটের মহাকাব্যিক জীবনের শুরু আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে (বর্তমান ইকুয়েডর, ব্রাজিল, কলম্বিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে)। থিওব্রোমা প্রজাতির ছোট্ট চিরসবুজ কোকোয়া বৃক্ষের ফল থেকে তৈরি হয় চকলেট। প্রাচীন গ্রিসে থিওব্রোমাকে বলা হতো 'দেবতার খাদ্য'। অধিকাংশ গাছের মতো এর ফল শাখায় জন্মায় না, জন্মায় গাছের মূল কাণ্ডে। এই ফলগুলোর ভেতরে গড়পড়তা ৪০টি করে কোকোয়া বীজ থাকে।

কোকোয়া গাছ, গাছের ফল ও বীজ

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বর্তমান ইকুয়েডরে কোকোয়া বৃক্ষের চাষ হতো। উদ্দেশ্য ছিল মদ্যপান উৎসব। জ্বী, ঠিকই পড়েছেন। এর ফলগুলো থেকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় উৎসবের জন্যে বানানো হতো মদ। তবে খুব দ্রুতই ফলকে ছাড়িয়ে কোকোয়া বীজগুলোই কেড়ে নেয় সমস্ত মনোযোগ।

সে-সময়ের স্থানীয় অনেক জনগোষ্ঠীর মতো মায়া সভ্যতার অধিবাসীরাও কোকোয়া বীজগুলোকে শুকিয়ে, পুড়িয়ে, গুঁড়ো করে কোকোয়া আটা বানাত। তারপর পানিতে মিশিয়ে এক ধরনের পানীয় তৈরি করত। সাথে মেশানো হতো মরিচ, ফুলের সুবাস ও ভুট্টা।

মধ্যযুগের একজন ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক এই পানীয় পান করে বলেছিলেন, 'মনুষ্য সম্প্রদায়ের চেয়ে শূকর সম্প্রদায়ের জন্যে বরং এ পানীয় অধিক উপযোগী!'

পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য এই পানীয়তে আসক্ত হয়ে যান। তার কথার ওপর ভিত্তি করে অভিজাত ইউরোপিয়ানরা এই পানীয় পান করতে শুরু করে। সে পানীয়তে অবশ্য মায়া অধিবাসীদের মতোই গোলাপ জল, ডিমের কুসুম, কাঠবাদাম মিশিয়ে নেয়া হতো।

পুষ্টিকর চকলেট! কিন্তু খেতে পারবেন তো?

একুশ শতকের গবেষণা মতে কোকোয়া বীজে আঁশ, এন্টি-অক্সিডেন্ট, মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ফ্ল্যাভোনলস ইত্যাদি উপকারি উপাদান আছে। তবে এ পুষ্টির আশায় নজরকাড়া মোড়কে লোভনীয় চকলেট খেলে ফল হবে উল্টো! খেতে হবে চিনি, ক্ষতিকর রঙ এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য মেশানোর আগে।

আর তা খেয়ে সেই ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিকের চেয়ে আপনি ভালো কোনো মন্তব্য করবেন কিনা তা অনিশ্চিত। কারণ সেটা এমনই তেতো যে, আপনার পোষা কুকুর-বিড়াল তা খেলে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে!

চকলেট খাচ্ছেন? নাকি লক্ষ লক্ষ শিশুর রক্ত পানি করা ঘাম!

শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে কোকোয়া বীজ হাইড্রোলিক প্রেসে গুঁড়ো করে এর উদ্ভিজ্জ চর্বি বের করে তা দিয়ে কোকোয়া মাখন তৈরি করা হতো। ফলে চকলেট বার, কেক ইত্যাদি মুখরোচক খাবার তৈরি সহজ হয়।

তবে সত্যটা হলো, প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে কোকোয়া বীজ সংগ্রহের প্রক্রিয়াটা মোটেই আধুনিক হয় নি। আজকের দিনেও চকলেট তৈরি কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য। যেহেতু এর ফল কাণ্ডের সাথে যুক্ত, তাই ফল মেশিন দিয়ে কাটলে কাণ্ডের ক্ষতি হয়ে গাছটাই মারা যাওয়ার ভয় থাকে। ফল পাড়তে হয় সাবধানে ছুরি দিয়ে কেটে। আর চাষের সমস্ত প্রক্রিয়ার জন্যেই প্রয়োজন মানবশ্রম।

পুঁজিবাদের লক্ষ্য সবসময় কম খরচে সর্বোচ্চ মুনাফা। মানবিকতা সেখানে ভাগাড়ে চাপা পড়া উচ্ছিষ্ট। শিল্প বিপ্লবের সময় স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক বেনিয়ারা দেখল কোকোয়া বৃক্ষের চাষ হতে পারে কৃষির স্বর্ণখনি। তাই এই চাষের জন্যে আফ্রিকার মানুষদের অন্যায়ভাবে দাস বানিয়ে ইকুয়েডর, ব্রাজিল ইত্যাদি স্থানে ধরে আনল তারা। এই দাসপ্রথা আজ অবধি বিদ্যমান। আরো সস্তায় উৎপাদন করার জন্যে এতে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শিশুদের।

বলা যায়, দোকান থেকে যখন কেউ চকলেট কেনে, হয়তো তাতে মিশে থাকে কয়েক মিলিয়ন পশ্চিম আফ্রিকান শিশুর রক্ত পানি করা ঘাম! বিশ্বের সর্বোচ্চ কোকোয়া উৎপাদনকারী দেশ আইভরি কোস্ট ও ঘানার পারিবারিক খামারগুলোতে কাজের পর অধিকাংশ সময় এ শিশুদের ন্যায্য পারিশ্রমিকটুকুও দেয়া হয় না।

ও হ্যাঁ, 'শিশুশ্রম মুক্ত' লেবেল লাগানো কিছুটা বেশি দামের চকলেট দেখে বিভ্রান্ত হবেন না যেন। মানবাধিকার কর্মীদের করা মামলা ধামাচাপা দিয়ে বেনিয়াদের বেশি মুনাফা করার কৌশল ছাড়া সেটা আর কিছুই না।

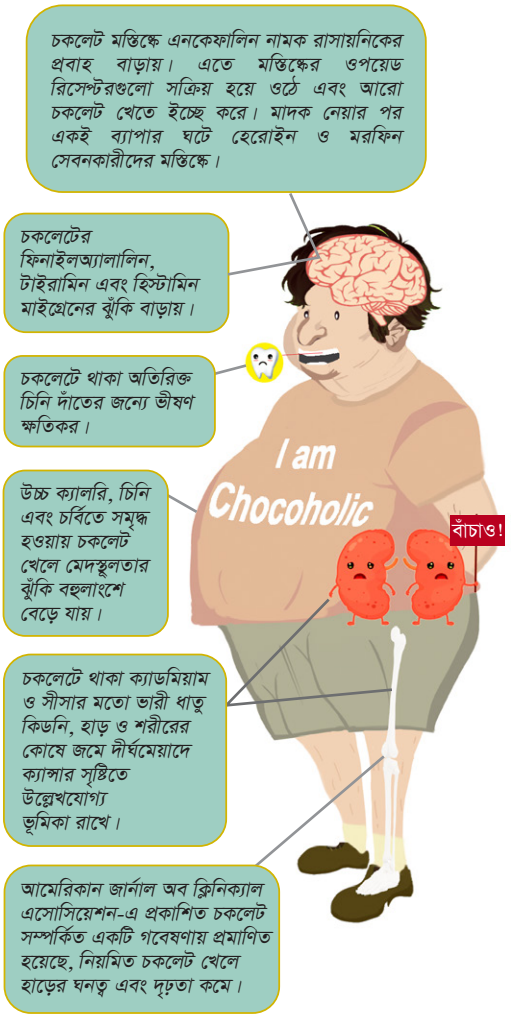

আপনার করণীয়

- ☐ উৎসবে, আনন্দ আয়োজনে, সাফল্য সংবাদে চকলেট, মিষ্টি ও চিনিজাত দ্রব্য পুরোপুরি বর্জন করুন। এর বদলে খেজুর খাওয়া ও খাওয়ানোর রেওয়াজ চালু করুন।
- ☐ আপনার শিশুকে ছোটবেলা থেকেই চকলেট, চিপস ইত্যাদি প্যাকেটজাত খাবারের বদলে স্ন্যাকস হিসেবে মৌসুমি ফল ও খেজুর খেতে অভ্যস্ত করুন।
- ☐ কারো বাসায় দাওয়াতে গেলে মিষ্টি বা চকলেটের বদলে খেজুর ও ফলমূল উপহার হিসেবে নিয়ে যান।
- ☐ খাওয়ার শেষে মিষ্টান্ন হিসেবে চকলেট, মিষ্টি বা জর্দার বদলে খেজুর, গুড়ের পায়েস ইত্যাদি খান।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট, ৩১ জানুয়ারি ২০২০
লস এঞ্জেলেস টাইমস, ২০ এপ্রিল ২০২০
মেডিকেল নিউজ টুডে, ১৭ জুলাই ২০১৮

মমতার পরশে দাফনসেবা
স্বেচ্ছাসেবীদের অনুভূতি

সাম্প্রতিক মহামারিকালে কোভিড ১৯-এ মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে দেশজুড়ে পরিলক্ষিত হচ্ছিল চূড়ান্ত অমানবিকতা। তাদের দাফন/ সৎকার, ওযু-গোসল-পরিচ্ছন্নতা এমনকি যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে মৃতদেহের কাছে যাওয়ার ব্যাপারেও ছিল অমূলক ভয়ভীতি ও আতঙ্কের বিস্তার।

অথচ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় একজন মৃতকে দাফন করা ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ এটি করা না হলে সমাজের সকলেই দায়ী থাকবেন।

চারপাশে এই যখন অবস্থা, তখন কোয়ান্টাম এগিয়ে আসে সীমিত সামর্থ্য নিয়েই। দ্রুততম সময়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষার্থী, গৃহিণী, পেশাজীবীসহ নানা শ্রেণি-পেশার সাত শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী নারী-পুরুষ দেশজুড়ে অংশ নেন দাফন/ সৎকার সেবায়। বহু ধরনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদা ও পরম মমতায় দুই সহস্রাধিক করোনা আক্রান্ত মৃতের শেষ বিদায় জানিয়েছেন তারা। সেই সব করোনাযোদ্ধা দাফনসেবীদের কয়েকজনের অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো। (সঙ্গত কারণেই কারো নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হলো না।)

১৮৩৭ দাফন	২৯৬ সৎকার
১৯ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	১৩ সমাধি

(২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)

বিপদের মুহূর্তে সবাই পর হয়ে যায় না

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। করোনায় ঘরবন্দি সময়ে জীবন সম্পর্কে নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম, তখনই কোয়ান্টাম দাফনসেবা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাই।

বাসায় বসে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নানা কিছু ভাবছিলাম, কিন্তু অসহায় মানুষের জন্যে কাজে নেমে বাস্তবতাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। বিপদের মুহূর্তে সবাই যে পর হয়ে যায় না, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মতো কেউ না কেউ অবশ্যই থাকে—এরই এক অনন্য দৃষ্টান্ত কোয়ান্টাম।

দাফন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমি যে কাজ করতে পেরেছি, আমার বয়সী অনেকের জীবনেই এ সৌভাগ্য হয় নি। সৎকর্মের মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণের পাশাপাশি আমি অন্যের শেষ বিদায়ে সম্মান জানাতে পেরেছি, এটা আমার জীবনের অনেক বড় সার্থকতা।

[শিক্ষার্থী]

লাইফ সাপোর্টে থাকা রোগীর কষ্ট অনুভব করেছি

দাফনের জন্যে একটি লাশ সংগ্রহ করতে একদিন গিয়েছিলাম একটি হাসপাতালের আইসিইউ-তে। গিয়ে দেখি লাশের বেশ কিছু জায়গায় সেলাই করা। দেখে কষ্ট হচ্ছিল। মমতার সাথে আমরা সবাই মিলে তার ওযু-গোসলের যাবতীয় কাজ শেষ করি।

আইসিইউ থেকে যতবারই লাশ নিতে গিয়েছি, দেখেছি রোগীর জন্যে লাইফ সাপোর্টে থাকা খুবই কষ্টের। পরিবার-পরিজন কেউ রোগীর পাশে থাকার সুযোগ পান না। পাশের বিছানায় একজন মারা গেলে অন্যজনের মৃত্যুভয় বেশি কাজ করে। মানসিকভাবে তিনি আরো দুর্বল হয়ে পড়েন।

এসব দেখে বার বার মনে হয়েছে, আল্লাহ যেন এমন কষ্টকর মৃত্যু কাউকেই না দেন। নিজের জন্যে স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করি—যেন আপনজনেরা পাশে থাকা অবস্থায় আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারি।

[চাকরিজীবী]

দাফন ও সৎকার সেবায় প্রয়োজনীয় পিপিই, মৃতদেহ বহনের এয়ারটাইট ও ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম গোছানোর কাজে ব্যস্ত কোয়ান্টাম স্বেচ্ছাসেবীরা।

সঙ্ঘের কারণে এ-কাজে অংশ নিতে পেরেছি

একদিন সকালবেলা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়েছি কোয়ান্টাম দাফন টিমের ভাইদের সাথে। সেটি ছিল দাফন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমার প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ।

টিম লিডার জানালেন, আজ আমরা একটি বেওয়ারিশ লাশকে ওযু-গোসল করিয়ে দাফন করব। মর্গে চেম্বার থেকে যখন মৃতদেহ নামানো হলো, ভয় পাচ্ছিলাম। তারপরও সাহস করে মৃতের কাছে গেলাম। প্রথমে তার সারা শরীরে জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটিয়ে দিলাম। এরপর একে একে তাকে দাফনের জন্যে প্রস্তুত করার কাজগুলোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম টিমের সবাই।

কাজের মাঝেই অনুভব করলাম—ভয়টা কীভাবে যেন চলে গেছে। পরিচ্ছন্নতা শেষে তাকে কাফনের কাপড় পরানো হলো। সব প্রস্তুতি শেষে এক ধরনের ভালোলাগা কাজ করছিল যে, এ মানুষের পাশে তো তার আপনজন কেউ নেই, কিন্তু আমরা কয়েকজন তার সাথে আছি। খুব মমতা অনুভব করছিলাম।

এরপর আমরা তাকে করোনায় মৃতদের জন্যে নির্ধারিত কবরস্থানে নিয়ে যাই। সেদিন আমি কবরেও নেমেছিলাম। সে এক অন্যরকম অনুভূতি! কাজের ব্যস্ততার মধ্যে বার বার মনে হচ্ছিল—এভাবে একদিন আমাকেও বিদায় নিতে হবে।

নিয়ম অনুযায়ী তাকে কবরস্থ করার পর পিপিই খুলে আমরা যখন দোয়া করছি, এমন সময় ঝুম বৃষ্টি নামল। আল্লাহ এ মৃত ব্যক্তিকে কবুল করেছেন এমন অনুভূতি হচ্ছিল আমার।

দাফন টিমে কাজ করতে আসার আগে আমি কখনো কারো লাশ দেখতেও যাই নি। আমি বিশ্বাস করি, শুধু সৎসঙ্ঘে একাত্ম থাকার কারণে আমার পক্ষে এ কাজগুলো করা সম্ভব হয়েছে।

দাফন শেষে প্রতিবারই জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু উপলব্ধি নিয়ে ফিরেছি, যা আমাকে মানসিকভাবে আরো দৃঢ় করেছে।

[চাকরিজীবী]

সময়ের কাজ সময়ে করার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি

আমার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলো। দেশে শুরু হলো করোনা। গুরুজী আহ্বান জানালেন, বয়স ১৮ হলে করোনা শহিদদের দাফনসেবায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিতে।

বড় ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় কিছুটা দোদুল্যমান অবস্থায় কোয়ান্টাম দাফন ক্যাম্পে গেলাম আট দিনের জন্যে। প্রথমদিন আমরা মরদেহের গোসল, জানাজা ও দাফনের প্রক্রিয়া শিখে নিয়েছিলাম। সরাসরি দাফনের কাজে যাওয়ার সুযোগ পেলাম পরদিনই।

টিমের সাথে গেলাম ঢাকার একটি হাসপাতালে। পাঁচ জনের মধ্যে আমি সবার ছোট। মৃতের গোসল, কাফনের কাপড় পরানো, গোসল শেষে আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করা এসব কাজে আমি টিম লিডারকে অনুসরণ করেছি। প্রতিটি কাজই পরিশ্রমের, কিন্তু ভালো লেগেছে এমন কাজে আসতে পেরেছি বলে।

কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে রাতে ঘুমাতে যাব, তখনই ডাক পড়েছে অমুক জায়গায় যেতে হবে দাফনের কাজে। ফিরতে ফিরতে রাত তিনটা বা তারও বেশি। উপলব্ধি করলাম, মৃত্যুর কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই!

দাফন ক্যাম্পে আসার আগে কোনো কাজ করতে হলে অনেক সময়ই মনে হতো—এটা কিছুক্ষণ পরে করলে দোষ কী? কখনো মনে হতো না যে, কিছুক্ষণ পর মৃত্যু হতে পারে, সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলি। এখানে এসে উপলব্ধি করেছি, যে-কোনো কাজের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখা এবং সময়ের কাজ সময়ে করার গুরুত্বটা কত বেশি!

[শিক্ষার্থী]

দাফন স্বেচ্ছাসেবীরা যেন একালের মুক্তিযোদ্ধা

ছোটবেলায় নিজেকে প্রশ্ন করতাম, ১৯৭১ সালে যদি আমি থাকতাম, আমি কি দেশের জন্যে যুদ্ধ করতাম? মনের ভেতর থেকে উত্তরটা সবসময় 'না' আসত। আমি ভয় পেতাম। সেই আমি করোনায় মৃতদের দাফনসেবায় অংশ নিয়ে বদলে গেলাম। এখন বিশ্বাস করি, দেশের কল্যাণে মানুষের কল্যাণে যে-কোনো কাজ আমি দায়িত্ব নিয়ে করতে পারব।

আসলে দাফনসেবার কাজটি অনেকটা মুক্তিযুদ্ধের মতোই। কোয়ান্টামের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এত বড় একটি কাজের সুযোগ করে দেয়ার জন্যে। কোয়ান্টামের সংস্পর্শে এসে আমি যেমন সাহসী হয়ে উঠেছি, তেমনি আমার সচেতনতাও বেড়েছে।

দাফনসেবায় আমার মা এবং আমি অংশ নিয়েছি। দাফন টিমে এসে আমরা শিখেছি কীভাবে মমতা ও যত্নের সাথে একজন মৃতকে শেষ বিদায় জানাতে হয়। আমি কিংবা আমার মা, যিনি-ই পৃথিবী থেকে আগে চলে যাই না কেন, আমরা একজন আরেকজনকে সুন্দরভাবে শেষ বিদায় জানাতে পারব—এই ভাবনাটি আমাদেরকে প্রশান্তি দেয়।

আমি প্রায় একমাস দাফনসেবায় কাজ করেছি। ক্যাম্পে অন্য স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে মিলেমিশে থাকা, সময়মতো প্রতিটি কাজ করার শিক্ষা পেয়েছি। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে আরো সচেতন হয়েছি।

[শিক্ষার্থী]

রায়েরবাজার বধ্যভূমি কবরস্থানে কোয়ান্টামের দাফনসেবা

দাফনসেবায় অংশ নিতে আর কখনো পিছপা হবো না

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সবসময় মানুষের ভালো কাজের সঙ্গী। এখানে যুক্ত থাকার কারণেই আমি করোনা শহিদদের দাফনসেবায় অংশ নিতে পেরেছি। আমি যে এই দুর্যোগের সময়েও অন্যের জন্যে কিছু করতে পারব তা ভাবি নি।

আমি দিনাজপুরে থাকি। পরিবারে রয়েছেন আমার স্বামী ও তিন মেয়ে। দিনাজপুর পার্বতীপুরে কোয়ান্টাম দাফন টিম থেকে যেদিন প্রথমবার কাজের অনুরোধ জানাল, আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম ছোট ছোট সন্তানদের রেখে যাব কিনা। পরদিন জানলাম, সে মহিলার দাফন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

এমন একটি ভালো কাজে না যাওয়ার কষ্ট মনের ভেতরে জেঁকে বসল। সিদ্ধান্ত নিলাম, আর কখনো দাফনসেবায় অংশ নিতে পিছপা হবো না। এরপর থেকেই নিয়মিত এ সেবা কাজে অংশ নিচ্ছি।

প্রথমে পরিবার ও চাকরির পাশাপাশি এ সামাজিক দায়িত্ব পালন একটু কঠিন মনে হচ্ছিল। তবে প্রথমদিন কাজ করে মনে হলো, এ-কাজকে আমার যাবতীয় কাজের পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে গুরুত্ব সহকারে। কারণ এরকম সেবা কাজের সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। আমার স্বামীও আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন এতে অংশ নিতে।

একদিন হঠাৎ খবর এলো আমাকে দাফনের কাজে যেতে হবে। এদিকে বাসায় মেহমান, রান্নাসহ নানা দায়িত্ব পালনে আমি খুব ব্যস্ত। আমার স্বামীকে বিষয়টি জানাতেই তিনি সম্মতি জানালেন।

এরপর রান্না, সন্তানদের দেখাশোনা, মেহমানদের আপ্যায়ন—সব তিনি নিজেই করলেন। পরম করুণাময়ের রহমতে ও স্বামীর আন্তরিক সহযোগিতায় একজন করোনা শহিদের দাফনের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম সেদিন।

এ-কাজে প্রতিটি পদেই অনুভব করেছি, আমরা যখন ভালো কাজের নিয়ত করি, আল্লাহ সব প্রতিকূলতা দূর করে দেন।

[ব্যাংকার]

দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি

কোয়ান্টাম দাফন টিমের সাথে যখন কাজের সুযোগ পেলাম, তখন রমজান মাস। করোনা-আক্রান্ত কারো মৃত্যুর খবর এলে আমরা পাঁচ-ছয় জনের একটি টিম পিপিই পরে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে চলে যেতাম। অবশ্য কাজের ধরনের ওপর আমাদের টিমের সদস্য সংখ্যা কমবেশি হতো।

একদিন বিকেলে দাফনের কাজে রওনা হলাম। হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ নিয়ে তা জীবাণুমুক্ত করা, নির্ধারিত ব্যাগে ভরে নেয়া এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পর যখন দাফন সম্পন্ন হলো, তখন রাত ৮টা।

এর মাঝে মাগরিবের আজান হয়েছে, ইফতারের সময় পেরিয়ে গেছে। এদিকে আমরা টিমের সবাই রোজাদার হলেও কিছু করার ছিল না আমাদের।

কারণ পিপিই হলো তিন স্তরের একটা পোশাক, হাতেও তিন স্তরের গ্লাভস, পায়ে ভারী বুট এবং তার ওপর থাকে আলাদা কভার, মুখে মাস্ক, চোখে গগলস, মাথাটাও পুরো ঢেকে ফেলতে হয়। দাফনের পুরো কাজ শেষ হওয়ার আগে জীবাণুরোধী এ পোশাক খোলার কোনো সুযোগ থাকে না।

সেদিন প্রবীণ এক ব্যক্তির দাফন হলো এবং তার পরিবারের কয়েকজন কবরস্থানে গিয়েছিলেন। দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির ছেলে আমাদের বললেন, 'আপনারা যেভাবে মমতা আর যত্ন নিয়ে কাজগুলো করলেন, আমরা আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। দেখেন, টাকা থাকলেই সবকিছু হয় না। আমাদের কোনোকিছুর অভাব নেই। কিন্তু আজ বাস্তবতা এমন যে, বাবার মৃত্যুর পর তাকে একবার স্পর্শ করার সুযোগও আমরা পেলাম না!'

ভদ্রলোক যখন কথাগুলো বলছেন, আমার নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। কারণ মানুষের যে অসহায় মুহূর্তে অর্থ-সম্পদও কোনো কাজে আসছে না, সেই সময় এভাবে আমরা পাশে দাঁড়াতে পারছি, সহযোগিতা করতে পারছি।

[শিক্ষার্থী]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমার বাবা মারা গেছেন। শেষ বয়সে তার যেটুকু যত্ন করার প্রয়োজন ছিল তা করতে পারি নি। খুব অনুশোচনায় ভুগছি। কী করতে পারি এই অনুশোচনা থেকে বাঁচতে?*

উত্তর : আপনার অনুশোচনায় আমরা সমব্যথী। কিন্তু অনুশোচনা বহন করে বেড়ানো অর্থহীন। যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে। এখন মানসিক কষ্ট থেকে বাঁচতে এক বা একাধিক এতিমের দায়িত্ব নিন, কোরআন বিতরণ করুন। আপনার আক্ষেপ ঘুচবে, সেইসাথে বাবার জন্যে এটি হবে সদকায়ে জারিয়া।

আর এতিমের যত্ন নেয়া তো আমাদের জন্যে খুব সহজ। এককভাবে বা কয়েকজন মিলে প্রতি মাসে আট হাজার টাকা কোয়ান্টামের এতিমান ফান্ডে দান করে একজন এতিমের দায়িত্ব নিতে পারেন। এ ফান্ডে একজনকে উদ্বুদ্ধ করা মানে এতিমের অভিভাবকের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই সংখ্যা যত বাড়বে, আমাদের সমাজ তত সুন্দর হবে। বঞ্চিত শিশুরা গড়ে উঠবে আলোকিত মানুষ হিসেবে। আর আমাদের ওপরে থাকবে আল্লাহর রহমত। কারণ এতিমের দায়িত্ব যে নেয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব নেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বয়োবৃদ্ধ মা-বাবার যে যত্ন নেয়া প্রয়োজন, এটাই সন্তানেরা কখনো কখনো ভুলে যায়। তবে মা-বাবার দায়িত্বও কোনো অংশে কম নয়। ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে সমমর্মী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাকে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাতে হবে। এ-ক্ষেত্রে সন্তানের সামনে দৃষ্টান্ত হতে হবে মা-বাবাকেই।

এ গল্প অনেকেই শুনেছেন, এক দম্পতি তাদের সন্তানদের নিয়ে যখন ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে, বৃদ্ধ বাবাকে তারা খেতে দেয় আরেকটা ছোট ভাঙা টেবিলে। কারণ বৃদ্ধ বাবা চোখে ভালো দেখেন না, হাত দুটোও কাঁপতে থাকে। খেতে বসে তিনি প্রায়ই টেবিল নোংরা করে ফেলেন। একসময় তিনি মারা গেলেন। তার পুরনো টেবিলটা ফেলে দেয়া হবে। কিন্তু ছোট্ট নাতি কিছুতেই সেই ভাঙা টেবিল ফেলতে দেবে না। বাবা তখন অবাক হয়ে জানতে চাইল—এই পুরনো টেবিল দিয়ে তুমি কী করবে? শিশুটি বলল, তুমি যখন বুড়ো হবে, তখন তুমিও তো আমাদের সাথে এক টেবিলে খেতে পারবে না। তখন এই টেবিলে তোমাকে খেতে দেবো।

একটি সত্য ঘটনা বলি।

অনেকদিন আগের কথা। মা মারা গেছেন। তার ইচ্ছা ছিল, স্বামীর পাশে যেন তাকে কবর দেয়া হয়। মায়ের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার মৃতদেহ ঢাকা থেকে নৌকায় করে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বুড়িগঙ্গায় কোনো মাঝি লাশ বহন করতে রাজি নয়। এক মাঝি নৌকা দিল, কিন্তু সে নৌকা বাইবে না।

তখন চাকরিজীবী ছেলে নিজেই নৌকা বেয়ে মায়ের মৃতদেহ নিয়ে গেলেন গ্রামের বাড়িতে। রওনা করার সময় তার ছেলেটি স্কুলে ছিল। বাসায় তাকে দেখার মতো কেউ ছিল না। তিনি প্রতিবেশীকে বলে গেলেন ছেলেকে দেখে রাখতে। ছেলেরও এ নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না। কারণ সে জানতে পারল, বাবা তার দাদির শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে গেছে। এই বাবাও পরবর্তীকালে ছেলের কাছ থেকে একই রকম সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

অর্থাৎ আপনার মা-বাবার প্রতি যে আচরণ আপনি করবেন, আপনার সন্তানের কাছ থেকেও প্রাকৃতিক নিয়মে তা-ই পাবেন।

অতএব যারা বয়োবৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করার সুযোগ পাবেন, তারা ভাগ্যবান। আন্তরিকভাবে তাদের যত্ন নিন, যাতে পরে অনুশোচনা করতে না হয়। আর যাদের মা-বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তারা যথাসাধ্য সৎকর্ম করুন, দান করুন, এতিমের দায়িত্ব নিন এবং সদাচারী ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ আপনার ভালো কাজগুলো মৃত মা-বাবার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে।

প্রশ্ন : *আমার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার মূলধন নেই। তাই ঋণ নিয়ে ব্যবসা করেন। কিন্তু আপনি বলেন, ঋণমুক্ত সচ্ছল জীবন প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এখন করণীয় কী?*

উত্তর : এই ঋণগুলোর সুদের হার অনেক বেশি। ভালোভাবে হিসাব করলে বুঝতে পারবেন, আপনার বাবা যা লাভ করেন তার সিংহভাগ চলে যায় সুদের পেছনে। তাছাড়া আয়ের সাথে সুদ জড়িয়ে গেলে সেটাতে কোনো বরকত থাকে না। একইসাথে ঋণ ও সুদ দুটোই যুক্ত হলো আপনাদের জীবনে। অথচ নবীজী (স) এ দুটো বিষয় থেকে সবসময় আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

তাই সচেতন হতে হবে। আপনার বাবাকে উদ্বুদ্ধ করুন ব্যবসায় কোনো ঋণ না রাখতে। প্রয়োজনে আরো ছোট পরিসরে শুরু করতে বলুন, যাতে লাভটা পুরোপুরি নিজের থাকে। ব্যবসায় মনোযোগী হতে উৎসাহ দিন এবং ঋণমুক্তির জন্যে দোয়া করুন।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আপনার নিয়ত। এই নিয়তটাকে ঠিক করতে হবে যে, আমার ব্যবসার মধ্যে কোনো ঋণ ও সুদ থাকবে না। প্রথমে কিছুটা কঠিন মনে হলেও দেখবেন, ভালো নিয়ত এবং হালাল উপার্জনে আল্লাহ সবসময় বরকত দেন।

প্রশ্ন : *পবিত্র কোরআনে বহুবার ক্ষমা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাই আমি আপনজনদের কাছ থেকে অন্যায় আচরণ পাওয়ার পরও তাদেরকে ক্ষমা করতে চাই। কিন্তু একবার ক্ষমা করার পর তারা যখন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে, তখন আর ক্ষমা করতে পারি না। আমি কীভাবে ক্ষমার মতো মহৎ গুণ অর্জন করতে পারব?*

উত্তর : ক্ষমা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ গুণ। আর অন্যকে ক্ষমা করতে হবে নিজের কল্যাণের জন্যেই। কারণ ক্ষমা না করা মানে হচ্ছে, মনে কষ্ট জমিয়ে রাখা, রাগ ক্ষোভ ঘৃণা জমিয়ে রাখা। কষ্টটা যদি থেকে যায় তা শুধু আপনার ভোগান্তিই বাড়াবে।

আপনি যত ক্ষমা করতে পারবেন, তত শান্তিতে থাকবেন। আপনার অন্তর হবে আবর্জনামুক্ত, পরিষ্কার। কারণ রাগ ক্ষোভ বিদ্বেষ ঘৃণা দুঃখ যন্ত্রণা হচ্ছে অন্তরের আবর্জনা। এসব আবর্জনা বহন করে বেড়ানো অর্থহীন।

রসুলুল্লাহর (স) জীবন দেখুন, তাঁকে কত কষ্ট দিয়েছে সত্য-অস্বীকারকারীরা! তারপরও তিনি সবাইকে ক্ষমা করেছেন। একবার রসুলুল্লাহর (স) কাছে এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা সবচেয়ে রেগে যাই আমাদের অধীনস্থদের ওপরে। তাদের কোনো ভুল হলে ক্ষমা করতে পারি না। রসুলুল্লাহ (স) বললেন, অধীনস্থকে ক্ষমা করে দেবে। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, কতবার ক্ষমা করব? রসুলুল্লাহ (স) হেসে বললেন, 'দিনে ৭০ বার'! এভাবে ক্ষমা করতে পেরেছেন বলেই নবীজী (স) প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

তাই যত অভিমান-রাগ-ক্ষোভ আছে, অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিন। প্রথমদিকে এটা পারবেন না, তখন ক্ষমার ভান করবেন। একটা সময় দেখবেন—আপনি ভেতর থেকে ক্ষমা করতে পারছেন। সবসময় মনে মনে বলবেন, আল্লাহর রসুল ক্ষমা করেছেন এবং তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেছেন। তাই আমিও ক্ষমাশীল হবো।

প্রশ্ন : *গুরুজী, আমি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আমার পরিবারে দুজন সদস্য প্রো-মাস্টার। তাদেরকে দেখেছি নিয়মিত বায়াতি অনুদান দিতে। একে নাকি সজ্ঘদান বলে। কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক, এতিমানসহ নানা খাতে আমি দান করি। প্রো-মাস্টার না হলেও আমি কি সজ্ঘদানে অংশ নিতে পারি?*

উত্তর : দানের ব্যাপারে আপনার আগ্রহের জন্যে অভিনন্দন। তবে দানের এ খাতটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বায়াতি অনুদানের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে সজ্ঘদান। সজ্ঘদানকে কখনোই গুরুদক্ষিণা মনে করবেন না। কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে এ অর্থ ব্যয় হয় না। এর পুরোটাই সজ্ঘের কাজে, সেবা কাজে ব্যয়ের জন্যে বরাদ্দ।

একটি সজ্ঘের অন্যতম ভিত্তি হলো এই সজ্ঘদান। কারণ সজ্ঘ যে সৎকর্ম করে, তা নিয়মিত চালু রাখার জন্যে অর্থপ্রবাহটা খুব জরুরি। এ খাতে দান যত বাড়বে, সজ্ঘ তার পূর্ণ শক্তি ও গতি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। সজ্ঘের সেবা কার্যক্রমগুলোও আরো সুন্দর এবং স্থায়ী হবে।

সজ্ঘদানের বড় সুবিধা হচ্ছে, এ দান যে-কোনো খাতে সজ্ঘ ব্যয় করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য খাতের এ স্বাধীনতা নেই। সজ্ঘ চাইলেই একটি খাতের দানের অর্থ অন্য প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে না।

প্রো-মাস্টারদের জন্যে সজ্ঘদান হওয়া উচিত আয় বা ব্যয়ের ন্যূনতম ৩%। যদি কারো ৩% দিতে অসুবিধা হয়, ধীরে ধীরে বাড়াতে চেষ্টা করবেন। যখন কেউ নিয়ত করে, আল্লাহ তার জন্যে কাজটি সহজ করে দেন। আর যাদের সামর্থ্য আছে, তারা ৩%-এর বেশি দান করবেন। তবে প্রো-মাস্টার না হলেও যে-কেউ সজ্ঘদান জমা দিতে পারেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

যত ছোট কাজই হোক,
সবসময় তা সবচেয়ে
ভালোভাবে করার চেষ্টা করব।

শুরু হলো প্রবীণ সেবা কার্যক্রম

বান্দরবান লামার কেয়াজুপাড়াস্থ লম্বাখোলা বাজার। ছোট্ট একটি খুপরি ঘরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন বৃদ্ধ সুরুজ মিয়া। তার প্রতিবেলার খাবারের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না, এমনকি পরিচর্যা করারও ছিল না কেউ। তার সেবাযত্নের দায়িত্ব নেয়ার মধ্য দিয়ে এবছর ২ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু হলো কোয়ান্টাম প্রবীণ সেবা কার্যক্রমের।

এ কার্যক্রমের প্রথম সেবার্থী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন সুরুজ মিয়া। এখন তার প্রতিবেলার খাবার, গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রবীণ সেবা কার্যক্রমের উদ্যোগে।

দুস্থ অবহেলিত প্রবীণদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে এ সেবা কার্যক্রম। সেবার্থীদের তালিকায় একে একে যুক্ত হয়েছেন আরো সাত জন। প্রত্যেকের আবাসস্থলে গিয়ে সেবা দেয়া হচ্ছে। কোয়ান্টামমের চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ান ও সেবা সেল সমন্বিতভাবে তাদের সেবায় কাজ করছে।

বার্ধক্য জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দেড় কোটি প্রবীণ রয়েছেন। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়াসহ নানা কারণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক মা-বাবাই অরক্ষিত ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন।

এ অবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়ানো সমাজের প্রতিটি সচেতন মানুষের দায়িত্ব। আপনজনের সান্নিধ্যবঞ্চিত এ প্রবীণদের মমতাপূর্ণ সেবা দেয়ার লক্ষ্যেই মানবিক একটি সঙ্ঘ হিসেবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ। এতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিয়ে একজন তরুণ সম্মান জানাতে পারেন সমাজে অবদান রাখা তার পূর্বসূরীদের প্রতি। সেইসাথে নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে পারেন জীবন সম্পর্কে নতুন এক উপলব্ধি।

কোয়ান্টাম প্রবীণ সেবা কার্যক্রমের প্রথম সেবার্থী পক্ষাঘাতগ্রস্ত সুরুজ মিয়া। ফাউন্ডেশন দায়িত্ব নেয়ার আগে তাকে এ অবস্থায় পায় (ওপরের ছবিতে)। বর্তমানে সুরুজ মিয়া (ডানের ছবিতে)।

বান্দরবান লামায় কোয়ান্টাম প্রবীণ সেবা কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিতে পারেন আপনিও। আপনার সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করুন এ কল্যাণকর কাজে। লামার কোয়ান্টামমে গিয়ে এ সেবা দিতে নাম তালিকাভুক্ত করুন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেলে।

মিরপুর সেন্টারে ‘গ্রাউন্ড জিরো’ শীর্ষক ওয়ার্কশপ

৩০ আগস্ট কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিরপুর সেন্টারে কোয়ান্টিয়ার ও আর্ডেন্টিয়ারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী বিশেষ কার্যক্রম। ‘গ্রাউন্ড জিরো’ শীর্ষক এ ওয়ার্কশপে স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়ম অনুসরণ করে অংশ নেন ফাউন্ডেশনের ১৬১ জন স্বেচ্ছাসেবী।

ওয়ার্কশপ শুরু হয় শিথিলায়ন মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। মেডিটেশনের পর শুরু হয় আলোচনা ‘গ্রাউন্ড জিরো : নতুন শুরু’। আলোচনায় উঠে আসে—একেকটি অর্জনকে গ্রাউন্ড জিরো ভেবে কাজ শুরু করতে হবে নতুন উদ্যমে। পাশাপাশি ‘সঙ্ঘের ছায়াতলে’, ‘সঙ্ঘ ও সঙ্ঘদান’, ‘চার মাসে আট মাসের কাজ : কেন ও কীভাবে?’ বিষয়ের ওপর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়।

‘চার মাসে আট মাসের কাজ : আমাদের করণীয়’ বিষয়ে ছিল গ্রুপ ডিসকাশন ও প্রেজেন্টেশন। আরো ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। *শুদ্ধাচার* বই থেকে ‘প্রতিবেশীর সঙ্গে’ অধ্যায়ের ওপর অনুষ্ঠিত হয় কুইজ।

এ প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় একই স্থানে ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টায়ন। এতে অংশগ্রহণ করেন ৬৭ জন কোয়ান্টিয়ার। কার্যক্রম দুটি পরিচালনা করেন মিরপুর সেন্টারের মোমেন্টিয়ার আবদুল্লাহ জুবাইর।

আপনার এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন :

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭১৪-০৪৭৬৩৬
blood.quantummethod.org.bd

কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে বিশেষ কার্যক্রম

চট্টগ্রাম

স্কুল, খেলার মাঠ, বেড়াতে যাওয়া—সবই বন্ধ। ভার্চুয়াল জগৎ ও ডিজিটাল স্ক্রিন হয়ে উঠেছে বহু শিশু-কিশোরের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এসময় ব্যতিক্রমী এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টার। ১৮ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়ম অনুসরণ করে এ কার্যক্রমে অংশ নেয় ৩৬ জন কিশোর-কিশোরী।

মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার ও অরিয়ন ফার্মার ট্রেনিং হেড কাজী শামীম। এ-ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাড়াতে ছিল বিভিন্ন ধরনের খেলা ও ‘শুদ্ধ উচ্চারণ’ পর্ব। তুলে ধরা হয় স্কুল বন্ধের দিনগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেকে এগিয়ে রাখার নানা উপায়। শিক্ষার্থীরা উপভোগ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র ‘আমার বন্ধু রাশেদ’। দীর্ঘ ছয় মাসের গৃহবন্দি জীবন শেষে দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

রাজশাহী

১৯ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারে উদীয়মান কোয়ান্টিয়ারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’। দুঘণ্টাব্যাপী এ প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন রাজশাহী সেন্টারের মোমেন্টিয়ার এডভোকেট কায়সার পারভেজ মেহেদী। স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়ম অনুসরণ করে এতে অংশ নেয় ৬৭ জন শিক্ষার্থী কোয়ান্টিয়ার।

প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব। আরো ছিল দাফন টিমে অংশগ্রহণকারী কোয়ান্টিয়ারদের বাস্তব অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ। এ-ছাড়াও ‘করোনাকালে কে কী শিখেছি’—এ নিয়ে লিখেছেন অংশগ্রহণকারীরা। ‘আত্মশক্তির অনুভব’ মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। কোয়ান্টিয়ারদের মেধা বিকাশে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামটি এখন থেকে প্রতি মাসে দুদিন রাজশাহী সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

সভ্যতা যাদের কাছে ঋণী

নিজের কাজ, দর্শন ও অবদান দিয়ে পৃথিবী ও সভ্যতাকে ঋণী করে গেছেন যারা—তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গুরুজী আলোকপাত করছেন ফাউন্ডেশনের নিয়মিত কার্যক্রমগুলোতে। সেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছে কোয়ান্টাম বুলেটিনের ধারাবাহিক এ আয়োজনে—

অসাম্প্রদায়িক ও মানবপ্রেমী সাধক
শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

কত ভাগ্যে সোনার বাংলায় জন্মলাভ করেছি। ... আমার মনে হয়, বাঙালির মহৎ কিছু দেবার আছে জগতে। বাংলা জাগলে ভারত জাগবে, ভারত জাগলে বিশ্ব জাগবে।

কথাটি বলেছিলেন নিজের বাঙালি পরিচয় নিয়ে গর্বিত বাংলার মহান সাধক ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বাংলা থেকেই একদিন ঘটবে আত্মিক ও নৈতিক পুনরুত্থান।

১৩১ বছর আগে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব বাংলাধীন পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে তার জন্ম। পেশায় তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। কলকাতা থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর নিজ গ্রামে ফিরে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করলেন।

চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'চিকিৎসাতে চাস্/ যদি তুই আত্মপ্রসাদ টাকা,/ টাকার পানে না তাকিয়ে/ রোগীর পানে তাকা।' যার মর্মার্থ—রোগীর সেবায় ব্রতী হলেই একজন চিকিৎসক হতে পারেন পরিতৃপ্ত ও বিত্তবান।

চিকিৎসক থেকে মানবতাবাদী সাধক

চিকিৎসক হিসেবে অল্পদিনেই বেশ সুনাম অর্জন করেন অনুকূলচন্দ্র। তার হাতযশের কথা ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন, বিচিত্র সমস্যায় পর্যুদস্ত মানুষের জীবন। মানুষকে যত দেখলেন, তাদের সাথে যত কথা বললেন, তত তিনি অনুভব করলেন—বেশিরভাগ রোগেরই উৎস হলো মূলত মানসিক বৈকল্য। মন যখন দূষিত হয় কোনো কারণে, তখনই দেহ হয়ে ওঠে রোগের বিচরণক্ষেত্র। মনের দূষণ সারানো গেলে ব্যাধিকেও জয় করা সম্ভব।

তার মনে প্রশ্ন এলো—দৈনন্দিন জীবনে যারা সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ বলে পরিচিত অথচ ইন্দ্রিয় ও রিপুর আগুনে জ্বলছে আর জ্বালাচ্ছে চারপাশের সবাইকে, গোটা পৃথিবীকে অশান্তির নরক কুণ্ডে পরিণত করে তুলছে, তাদের চিকিৎসার উপায় কী?

তিনি ডুব দিলেন সমাধানের সন্ধানে এবং ডাক্তার থেকে হয়ে উঠলেন সাধক। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। যে সত্যটি চিকিৎসকরা এই শতাব্দীতে এসে বলছেন—শতকরা ৭৫ ভাগ রোগ মনোদৈহিক, সে কথাটিই ১৯৪০-এর দশকে বলেছেন তিনি। আত্মিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তার বাণী-সংকলন *সত্যানুসরণ* বাংলা ভাষার একটি কালজয়ী গ্রন্থ।

অসাম্প্রদায়িক জীবনদৃষ্টি ছিল তার সহজাত

একজন ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও নিজের বংশপদবি 'চক্রবর্তী' ব্যবহার করতেন না এই সিদ্ধপুরুষ। তার অনুসারীদের মধ্যে হিন্দুর পাশাপাশি ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানও। প্রকৃতই তিনি ছিলেন জাতপাত ও ভেদাভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে।

বাংলাকে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনভূমিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল, অবিশ্রান্ত। মজা করে বলতেন, আমার নাম অনুকূল বটে, কিন্তু জীবনে প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই আমাকে এগোতে হয়েছে প্রতিকূলতার পাহাড় কেটে।

সেকালে ইংরেজরা পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিত। বাংলাতেও তারা তা করিয়েছিল। ঠাকুর তখন বলেছিলেন, বৈশিষ্ট্যগত মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও যদি নারী-পুরুষ মিলে সংসার করতে পারে, তবে শুধু ভিন্ন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছে বলে কেন হিন্দু মুসলমান নিজেদের জন্মভূমিতে পাশাপাশি বসবাস করতে পারবে না?

সৎসঙ্গ ॥ সব মানুষের মিলনক্ষেত্র

শুধু 'ঈশ্বর ঈশ্বর', 'ভগবান ভগবান', 'আল্লাহ আল্লাহ' জপলে হবে না, সৎকর্ম করতে হবে—এ বিশ্বাস থেকেই 'সৎসঙ্গ' গড়েছিলেন ঠাকুর অনুকূল। তার আশ্রমে ছিল স্কুল, ছিল তাঁত-কারখানা। পড়াশোনার পাশাপাশি সৎভাবে উপার্জন করার ব্যবস্থাও ছিল সেখানে।

পাবনায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সৎসঙ্গ। দেশভাগের পর ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সরকার এ জায়গা অধিগ্রহণ করে। ঠাকুর তখন সরকারের কাছে আবেদন জানান—সৎসঙ্গ একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, তাই সব সম্প্রদায়ের মানুষের এখানে প্রবেশাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। সব সংস্কৃতির মানুষের ধর্ম, কৃষ্টি, সদাচারে এ জায়গা একদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। অতএব এটা সেভাবেই রাখা হোক। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সেখানে প্রথমে যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং পরে মানসিক রোগের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।

ইতঃপূর্বে ১৯৪৬ সালে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে বিহারের দেওঘরে যান। সেখানকার নির্মল বাতাসে তিনি সুস্থ হলেন। দেশভাগ হওয়ার পর তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হয় নি। ফলে তিনি দেওঘরেই থেকে যান এবং সেটাই কালক্রমে তার মূল কর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়।

সৎসঙ্গ নিয়ে তিনি বলেন, 'সৎসঙ্গ চায় মানুষ। ঈশ্বরই বলো, খোদাই বলো, ভগবান বা অস্তিত্বই বলো; ভূ ও মহেশ্বরে যিনি এক—তাঁরই নামে, ... সে বোঝে প্রত্যেকেই তাঁর সন্তান। সে পাকিস্তান বোঝে না, হিন্দুস্তান বোঝে না, রাশিয়া বোঝে না, চায়না বোঝে না, ইউরোপ-আমেরিকাও বোঝে না। সে চায় মানুষ। সে চায় প্রত্যেক লোক। সে হিন্দু হোক মুসলমান হোক খ্রিষ্টান হোক বৌদ্ধ হোক বা যে-ই হোক না কেন, যেন সমবেত হয় তাঁরই নামে।'

বিভেদ নয়, ধর্ম মানে ঐক্য

ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'প্রেমের সহিত খোদার পথে চলাই আমাদের ধর্ম। এর চাইতে বড় নীতি আর কী হতে পারে জানি না।'

'তোমার ধর্ম যদি জীবের বিশেষত মানুষের মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে বাঁচার সমর্থ করে তুলতে না পারল;

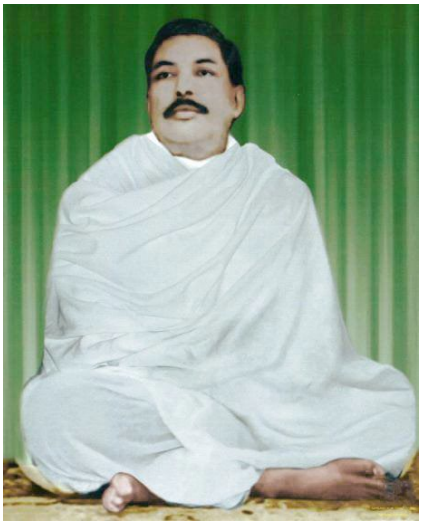

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ – ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৯)

সপারিপার্শ্বিক সে যাতে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে এমনতর না করে; তুমি কি মনে করো ধর্ম তোমার কাছে জ্যান্ত? আর তাতে তোমার সার্থকতাই কতটুকু?'

সাম্প্রদায়িক বিভেদ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ধর্ম থেকে চ্যুত হলেই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ-বিরোধ সৃষ্টি হয়। হিন্দু যদি প্রকৃত হিন্দু হয়, মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হয়, তারা বান্ধব-বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য। বাপকে যে ভালবাসে সে কখনো ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্যই এক ও অদ্বিতীয়। তাই সম্প্রদায়গুলো ভাই ভাই ছাড়া আর কী?'

তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'ধর্ম যদি বিপন্ন হয়ে থাকে, তবে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়েছে (ধর্মের) দুরভিসন্ধিপ্রসূত ব্যাখ্যাদানকারী ও যাজকদের হাতে। প্রত্যেক ধর্মমতের আসল রূপটি তুলে ধরতে হবে সাধারণ লোকের কাছে, তাহলে দুষ্ট লোকের জারিজুরি খাটবে না। প্রত্যেকে চেষ্টা করবে বাস্তব আচরণে স্ব-ধর্মনিষ্ঠ হতে এবং অন্যকেও সাহায্য করবে, প্রেরণা জোগাবে অমনতর হয়ে উঠতে।

এমনতর হতে থাকলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে কত দিন লাগবে? আমি তো বুঝি হিন্দুদের প্রতিষ্ঠা যেমন আমার দায়, ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাও তেমনি আমারই দায়। আমার পরিবেশের প্রত্যেকে তার মতো করে যদি ঈশ্বরপরায়ণ না হয়ে উঠে, আদর্শপ্রেমী না হয়ে উঠে, ধর্মনিষ্ঠ হয়ে না উঠে, তাহলে তো আমারই সমূহ বিপদ।'

একজন মানুষ যে কতটা অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী হতে পারেন, তারই প্রকৃত দৃষ্টান্ত ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমৃত্যু মানুষের জন্যে কাজ করে গেছেন এই মহান সাধক।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : অক্টোবর ২০২০ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd